স্টিফেন হকিং-এক অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানী

সুমন পাল
paul_suman30@yahoo.co.in

বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম যদি কাউকে করতে বলা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সে আইনস্টাইনের নাম করবে। সেটা বিজ্ঞানীর সৌম্যকান্তি, আলুলায়িত কেশের পরিচিত ছবির জন্য হতে পারে। তারপর যদি কোন বিজ্ঞানীর নাম সাধারন জনমানসে আসে তো তিনি হকিং। সেটাও কিন্তু তাঁর হুইলচেয়ার-এর সৌজন্যে হতে পারে। সে বিতর্কে যাচ্ছি না। তবে তিনি কতোটা জনপ্রিয় এবং পরিচিত মুখ ছিলেন সেটার একটা নমুনা আমরা পেতে পারি বিখ্যাত বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েকের পুরীর সমুদ্রসৈকতের গড়া হকিং-এর প্রতিমূর্তি থেকে।

পুরীর সমুদ্রসৈকতের বিখ্যাত বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েকের গড়া হকিং

স্টিফেন উইলিয়াম হকিং একাধারে অধ্যাপক, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, মহাবিশ্ববিদ, লেখক, এবং বিজ্ঞান-জনপ্রিয়কারী। জীবনের বেশির ভাগ সময় মোটর নিউরন রোগে আক্রান্ত হয়ে হুইলচেয়ারে কাটিয়েছেন, তীব্র নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়েছেন। তারপরেও তাঁর অর্জনের খাতা অনেকের থেকে অনেক বেশি মহিমান্বিত। তিনি এক চলমান আদর্শ, যিনি পদে পদে বুঝিয়ে দিয়েছেন জীবনে চলার পথে কোনো বাধাই ইচ্ছাশক্তিকে দমাতে পারে না। কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কিত গবেষণা স্টিফেন হকিংকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি তাঁর জীবনব্যাপী কাজের মাধ্যমে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন বিজ্ঞান মানুষের জন্যই – বিজ্ঞানের জন্য মানুষ না।

স্টিফেন হকিং-এর জন্ম ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারি ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে। ঐদিনটি আবার একটি বিশেষ দিন; কারন ওটা ছিল আরো এক মহামানব গ্যালিলিওর ৩০০ তম প্রয়াণ দিবস। আশ্চর্য সমাপতন। তাঁর বাবা ছিলেন জীববিদ্যার গবেষক। মেধাবী পরিবারেই জন্ম হয়েছিলো তাঁর এবং মা-বাবা ছেলেমেয়ের পড়াশোনার দিকে বেশ মনযোগও দিয়েছিলেন। জার্মানির বোমাবর্ষণ থেকে বাঁচতে হকিং লন্ডন ছাড়েন মায়ের সাথে। লন্ডন এবং সেন্ট অ্যাবান-এ হকিং-এর বেড়ে ওঠা। প্রাইমারি স্কুলে অনেকদিন পার করার পরেও হকিং পড়তে পারতেন না, এজন্য তিনি স্কুলকেই দোষ দিয়েছেন। অবশ্য সেটা কেটে গিয়েছিলো কয়েক বছরের মধ্যেই। স্কুলে অনেকেই তাকে 'আইনস্টাইন' বলে ডাকতো। এতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হকিং 'আইনস্টাইন' ডাকনামটার নামকরণের সার্থকতা যাচাই করে যাচ্ছিলেন অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে। প্রফেসর রবার্ট বারম্যানের মতে পড়াশোনা ছিলো তার কাছে জলভাত। অক্সফোর্ড থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর, ১৯৬২ সালে কেমব্রিজের ট্রিনিটি হল।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল তখন কেমব্রিজে পড়াচ্ছেন। হকিং চেয়েছিলেন, তাঁর সাথে কাজ করতে। কিন্তু তাকে গাইড হিসেবে পাওয়া গেলো না। হয়েল অনেক ব্যস্ত ছিলেন, এটা একটা কারণ হতে পারে। এমন একজন গবেষকের সাথে কাজ করতে না পেরে ভীষণ মন খারাপ হয়েছিলো তাঁর। তবে এটা হকিং-এর জন্য শাপে বর হয়েছিল একদিন। তাঁর ডক্টরেটের গাইড ছিলেন ডেনিস স্কিয়ামা। হকিং যে বিষয়ে কাজ করতেন, তার নাম সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং কসমোলজি বা ব্রহ্মাণ্ডতত্ব। নাম থেকেই গবেষণার বিষয় বোঝা যায়।

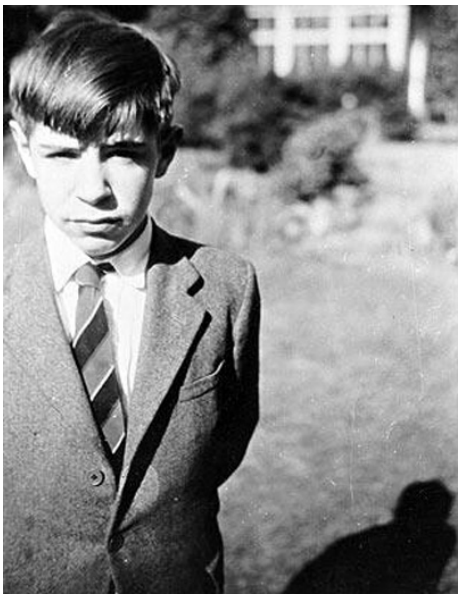

ছাত্রাবস্থায় হকিং

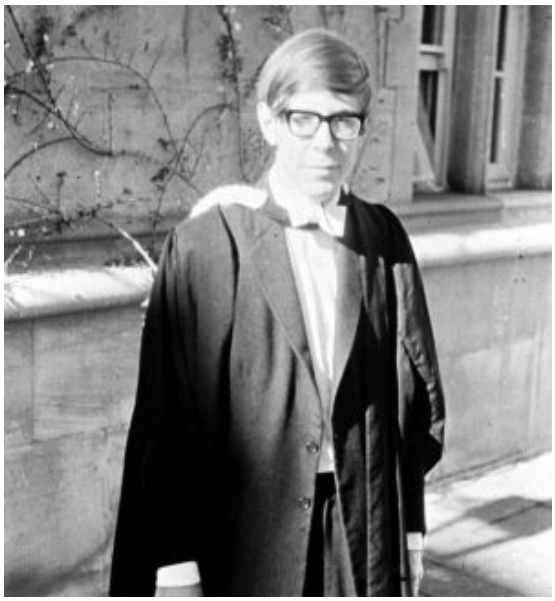

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক হওয়ার পর হকিং

ডেনিস স্কিয়ামা ছিলেন আধুনিক কসমোলজির স্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর সাথে কাজ করতে গিয়ে, প্রথমদিকে নিজের গণিতজ্ঞান নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। অক্সফোর্ডে গণিত বিভাগ না থাকলেও নিজের চেষ্টায় সাধারণ আপেক্ষিকতা আর মহাবিশ্বতত্ব নিয়ে কাজ শিখে নিতে লাগলেন তিনি। এমন সময় তার বোনের বন্ধু জেইন ওয়াইল্ডের সাথে দেখা হলো তাঁর। ফরাসি সাহিত্যে পড়ুয়া এই মেয়েটার সাথে খুব দ্রুত তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে, পরে যেটা বিয়েতে পরিনতি পায়।

কৈশোরে ঘোড়ায়-চড়া ও নৌকা-চালানোয় বিশেষ উৎসাহ থাকলেও, কেমব্রিজে থাকাকালীন হকিং-এর মোটর নিউরোনে সমস্যা, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) রোগ ধরা পড়ে। এই রোগে পেশী নাড়ানো যায় না, আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে, শরীর অথর্ব হয়ে পড়ে, কথা বলা অসম্ভব হয়ে যায়, খাবার গেলা যায় না, আস্তে আস্তে নিঃশ্বাসও আটকে যেতে থাকে। তখন ১৯৬৩, তাঁর মাত্র ২১ বছর বয়স। এসময় সবচেয়ে বড় ভরসা হয়ে পাশে দাঁড়ালো তাঁর প্রেমিকা জেইন ওয়াইল্ড। হকিং সেই সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছিলেন, “আমাদের বাগদান আমাকে বেঁচে থাকার রসদ যুগিয়েছিলো।” ১৯৬৫ সালে দুজনে বিয়ে করে ফেললেন।

হকিং ও জেইন ওয়াইল্ড, ১৯৬৫-এর ১৪ই জুলাই, বিয়ের দিন

সত্তরের দশকে তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন কৃষ্ণগহ্বর-এর এক নতুন গাণিতিক তত্ত্বের সুবাদে। আমরা জানি যে সনাতন পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে কৃষ্ণগহ্বর হল এমন শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের উৎস যাকে অগ্রাহ্য করে কোনো কিছুই গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। অপর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী রজার পেনরোজের কৃষ্ণগহ্বর সংক্রান্ত উপপাদ্যটিকে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর থিসিসে। এর পরে তিনি রজার পেনরোজের সঙ্গেই কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁদের যৌথ গবেষণার ফল হিসাবে আমরা আরো কয়েকটি উপপাদ্য পেয়েছি যাদের একসঙ্গে পোশাকি নাম হকিং-পেনরোজ অনন্যতা উপপাদ্য। এই গবেষণায়

কাজে লেগেছিল একটি বিশেষ সমীকরণ যার সঙ্গে আমাদের দেশের এক বিজ্ঞানীর নাম জড়িত। সাধারণ আপেক্ষিকতা বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরির আবিষ্কৃত 'রায়চৌধুরি সমীকরণ' ব্যবহার করেছিলেন হকিং ও পেনরোজ। এই সময় থেকেই তাঁর কথা বলার অসুবিধে হতে থাকে, তবে অদম্য হকিং তার কাজ থামিয়ে রাখেননি; মূলত সময় অল্প, তাই কাজ শেষ করতে হবে, ওটাই হয়ে ওঠে তাঁর কাজের অনুপ্রেরণা।

১৯৭৪-এ তিনি আমাদের পরিচিত করেন এই কৃষ্ণগহ্বর-এর আরো একটি রূপের সাথে। নেচার পত্রিকায় তাঁর আবিষ্কারের সংবাদটি প্রকাশিত হয়, নাম ছিল – 'ব্ল্যাক-হোল এক্সপ্লোশানস?' এবার ব্যাখ্যা দেন এর অন্তিম সময়ের, তিনি গাণিতিক ভাবে জগৎবাসীকে দেখান যে এই কৃষ্ণগহবর শুধু শুষে নেয় না, উগরেও দেয় নিজের অন্তিম দশায়। এই উগরে দেওয়া শক্তিও অপরিসীম। কৃষ্ণগহ্বর থেকে নির্গত এই বিকিরণ হকিং বিকিরণ নামে পরিচিত। সনাতন পদার্থবিদ্যা অনুসারে কৃষ্ণগহ্বর থেকে কখনোই কোনো কিছু বেরিয়ে আসতে পারে না। হকিং দেখালেন যে কণাবলবিদ্যা এবং তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণ নির্গত হতে বাধ্য। আমরা জানি কোনো সিস্টেমের বিশৃঙ্খলার পরিমাপকে বলে এনট্রপি। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী যে কোনো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় এনট্রপি বৃদ্ধি পায়। হকিং দেখালেন যে কৃষ্ণগহ্বরের সীমানার ক্ষেত্রফল হল তার এনট্রপির পরিমাপ। যে কোনো কৃষ্ণগহ্বরের একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে এবং তাপমাত্রা থাকার অর্থ হল তাপগতিবিদ্যা অনুসারে তার থেকে একটা বিকিরণ নির্গত হবে। তিনি দেখালেন কণাবলবিদ্যা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

হকিং তাঁর ওই মহাবিশ্বের তত্ত্বের জন্য ১৯৭৪-এ রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন মাত্র ৩২ বছর বয়সে। ১৯৮১ সালে তিনি প্রস্তাব করেন যে, বিকিরণ করতে করতে যখন কৃষ্ণগহ্বর উবে যায়, তখন এর ভেতরের তথ্যগুলোও হারিয়ে যায়। কিন্তু তথ্য তো কখনো হারিয়ে যায় না। তাই, এটা নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান জগতে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। তথ্যসংক্রান্ত এই বৈপরীত্যের নাম Blackhole Information Paradox. পরবর্তীতে তিনি কেমব্রিজের লুকেশিয়ান গণিত প্রভাষক হিসেবে অভিষিক্ত হন। এই সম্মান বড় দুর্লভ, মনে রাখতে হবে এই পদে কাজ করেছিলেন স্যার আইজাক নিউটন, চার্লস ব্যাবেজ এবং পল ডিরাক-এর মতো ব্যক্তিত্বরা।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে হকিং

১৯৮৫ সালে হকিং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন, তাঁর শারীরিক অবস্থা হয়ে উঠেছিলো ভয়াবহ। তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই, হকিং-এর শ্বাসনালী কেটে সেখানে টিউব বসানো হয়। ALS এর জন্য আগে এমনিতেই তার কথা জড়িয়ে যেতো, এবার তিনি সম্পূর্ণরূপে বাকশক্তি হারালেন। ক্রমশ তাঁর যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নানা প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। তাঁর এক সহযোগী পদার্থবিদ ক্যালিফোর্নিয়ার একটা কোম্পানি Words Plus এ যোগাযোগ করলেন। এই কোম্পানি কম্পিউটার আর হাতের মধ্যে রাখা ক্লিকার ব্যবহার করে শব্দ আর বাক্য বানানোর মত সফটওয়্যার বানিয়েছিলো। এই সফটওয়্যারটাকে একটা ভয়েস সিনথেসাইজারের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলো Speech Plus নামের একটা কোম্পানি। এরপর থেকে মিনিটে পনেরোটার মত শব্দ বলতে পারতেন তিনি।

যেজন্য তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের মতো তথাকথিত কঠিন বিষয়ের একজন বিজ্ঞানী সেলেব্রিটি হলেন সেটা হল সর্বসাধারণের জন্য সাধারণ ভাষায় একটা বই লেখা। বইটার প্রথম খসড়া প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো ১৯৮৪ সালে। কিন্তু তাঁর প্রকাশকের কাছে বইটা কঠিন মনে হওয়ায় (মানুষ বুঝবে না মনে হওয়ায়) আরো সহজ ভাষা ব্যবহার করতে বলেছিলেন। অবশেষে ১৯৮৮ সালে বইটা প্রকাশিত হলো, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখলেন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সেগান। বইটা যে পৃথিবীর

কতোগুলি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এতদিনে প্রায় আড়াই কোটির ওপরে কপি বিক্রি হয়ে গেছে। সেই বিখ্যাত বইটি হল 'এ ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইমঃ ফ্রম দি বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাক হোলস।' ঐতিহাসিক বেস্টসেলার হিসেবে ১৯৯৮ সালে 'গিনেস বুক অফ রেকর্ডস্'-এ স্থান পায় বইটি।

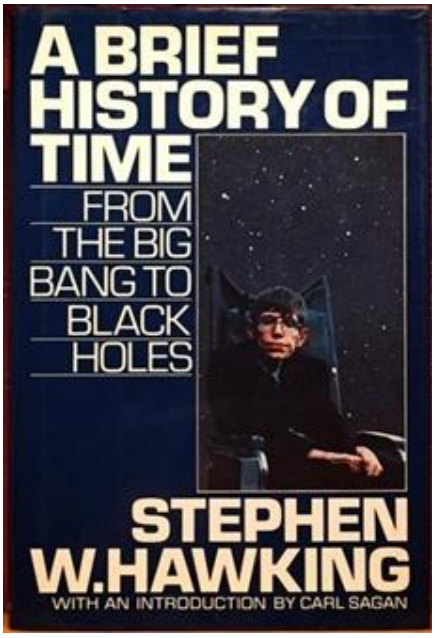

এ ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইমঃ ফ্রম দি বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাক হোলস-এর প্রচ্ছদ

সাকুল্যে পেয়েছেন ১২ টি বিশ্বমানের সম্মান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কেমব্রিজের লুকেশিয়ান প্রফেসর অফ ম্যাথমেটিক্স-এর গৌরবজনক পদ, যে পদে উনি ছিলেন ৩০ টি বছর, রয়েল সোসাইটির অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং হিউজেস পুরস্কার, পোপ ষষ্ঠ পল-এর থেকে তিনি এবং রজার পেনরোজ পান বিজ্ঞানের জন্য Pius XI পুরস্কার, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের সম্মানিক কমান্ডার উপাধি, উলফ পুরস্কার, কপ্লে মেডেল এবং ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স-এর পুরস্কার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর দেওয়া ২০০৯ সালে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বেসামরিক সম্মান প্রেসিডেন্ট মেডেল অফ ফ্রিডম। তাঁকে নোবেল না দিয়ে আমরা প্রমান করেছি পুরস্কার শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য একটা কথা হল, নতুন আবিষ্কার সবসময়েই পুরানো জ্ঞানকে ছাপিয়ে যাবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার করবে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রই হল বিজ্ঞানের রেনেসাঁস। হকিং-এর গবেষণা বিজ্ঞানের অনেক প্রচলিত ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে, তাই তাঁর অবদান হল বিজ্ঞানের বিপ্লব।

তিনি এবং তাঁর স্ত্রী জেইন একসাথে পথ চলা বন্ধ করেন ১৯৯১ সালে। এই বিচ্ছেদের চার বছর পর তিনি আবার বিয়ে করেন তাঁর অসুস্থ থাকাকালীন অবস্থায় তাকে পরিচর্যা করা নার্স এলিনি ম্যাসনকে। ২০০৬ সালের দিকে সেই সম্পর্কেরও ইতি টানেন তিনি।

দীর্ঘ ৪০ বছর যিনি হুইলচেয়ার সম্বল জীবনযাপন করছেন তার থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি জীবদ্দশায় মুক্ত হতে পেরেছিলেন। ২০০৭ সালে স্যার রিচার্ড ব্র্যানসন-এর ভার্জিন এয়ারলাইনস এক বিশেষ প্রযুক্তিতে রকেটের ধাঁচের বিমানে হকিং-কে নিয়ে যান উচ্চতর বায়ুস্তরে। তিনি হুইলচেয়ার ছেড়ে মুক্ত মানুষ হয়ে আনন্দে শিশুর মত ওই বিমানে অভিকর্ষবিহীন হওয়ার আনন্দ উপভোগ করেন ডিগবাজি খেয়ে। অসামান্য এই মানুষের কত কম প্রাপ্তি হয়েছিল কত বড়।

হকিং-এর জিরো গ্রাভিটি অনুভব

এরপরে তাঁর যোগাযোগ করার ক্ষমতাও লোপ পেতে থাকে। ২০১১-এর দিকে, মিনিটে ১৫ টার জায়গায় ২ টো শব্দে এসে দাঁড়ালো তাঁর যোগাযোগের গতি। তখন এগিয়ে আসে ইন্টেল কোম্পানি। তারা কম্পিউটার-হিউম্যান ইন্টারঅ্যাকশন ডিজাইন-এর মাধ্যমে হকিং-এর জন্য এমন ব্যবস্থা করেন যাতে তাঁকে কোনো শব্দ টাইপ না করতে হয়, বরং তিনি যাতে দেখানো শব্দগুলো থেকে দ্রত বাছাই করতে পারেন। বারবার তারা সেটার ইন্টারফেস পাল্টেছেন, যাতে তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে শব্দ বাছাই করতে পারেন। জীবনকে কতখানি ভালবাসলে এইরকম শারীরিক অবস্থায়ও ২০১৬ সালে তিনি বক্তৃতা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৮ই এপ্রিল, ২০১৬-য় হাভার্ডের স্যান্ডারস্ থিয়েটারে বক্তৃতা দিচ্ছেন স্টিফেন হকিং

হকিং-এর প্রথমা স্ত্রীর জেইন-এর লেখা বই Travelling to Infinity: My Life with Stephen-এর উপর ভিত্তি করে একটা সিনেমা বানানো হয়েছিলো ২০১৪ সালে। Theory of Everything. হকিং সেই সিনেমাটা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। হকিং-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এডি রেডমেইন। সিনেমাটা আসলেই চমৎকার! আর এডি রেডমেইন একটা অস্কারও জিতে নিয়েছেন হকিং-এর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য।

কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কিত গবেষণা স্টিফেন হকিংকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। তবে তিনি সব থেকে বেশি পরিচিত তার বইগুলোর জন্য। বিজ্ঞানকে সবার কাছে আনন্দময় ও সহজ করে তুলতে সক্ষম সেই বইগুলোর জন্যই তিনি মানুষের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন। তার লেখা বইয়ের তালিকাঃ

- A Brief History of Time (From the Big Bang to Black Holes) (1988)
- Black Holes and Baby Universes and Other Essays (1993)
- Black Holes & Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy (Kip Thorne, and introduction by Frederick Seitz) (1994)
- The Nature of Space and Time (with Roger Penrose) (1996)
- The Large, the Small and the Human Mind (with Roger Penrose, Abner Shimony and Nancy Cartwright) (1997)
- The Universe in a Nutshell (2001)
- On the Shoulders of Giants (2002)

হকিং-এর জীবনী আধারিত সিনেমার পোস্টার

- The Future of Spacetime (with Kip Thorne, Igor Novikov, Timothy Ferris and introduction by Alan Lightman, Richard H. Price) (2002)
- God Created the Integers: The Mathematical Breakthroughs That Changed History (2005)
- A Briefer History of Time (with Leonard Mlodinow) (2005)
- The Grand Design (with Leonard Mlodinow) (2010)
- The Dreams That Stuff Is Made of: The Most Astounding Papers of Quantum Physics and How They Shook the Scientific World (2011)
- My Brief History (2013)

তিনি জন্মেছিলেন গ্যালিলিওর মৃত্যুবার্ষিকীতে। আর মৃত্যুবরণ করলেন আইনস্টাইনের জন্মবার্ষিকীতে। আশ্চর্য সমাপতন। রেখে গেলেন তিন সন্তান – লুসি, রবার্ট এবং টিম-কে। ২০১৮ সালের ১৪ই মার্চ, প্রয়াত হলেন এ যুগের সবচেয়ে পরিচিত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। স্টিফেন হকিং মারা যাওয়ার আগে জানতে চেয়েছিলেন, তোমরা আমার সমাধির স্মৃতিফলকে কী লিখতে চাও? সমাধানটা অবশ্য তিনিই দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আগেই বলা

হয়েছে ব্ল্যাকহোলের 'এনট্রপি' নামের প্যারামিটার থাকা আবশ্যক। তা নাহলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী হয়ে যায়। এঅবস্থায় সহকর্মী বেকেনস্টাইন এবং স্টিফেন হকিং এর যৌথ প্রয়াস ছিল,

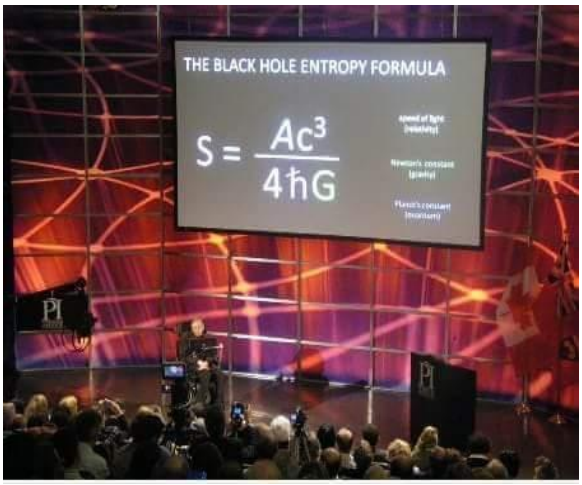

এনট্রপির সেই সমীকরন

ব্ল্যাকহোলের এনট্রপির সমীকরণ। তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণটি যেন লেখা থাকে তাঁর সমাধিফলকে। আমরা আশা করতেই পারি তাঁর সম্মানে তাঁর সমাধিতে এই সমীকরণ জ্বলজ্বল করবে। কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-এর রহস্য উদ্ঘাটনকারী গোয়েন্দার নশ্বর দেহ থেকে নির্গত শেষ বিকিরন কি হারিয়ে গেল কালেরই কোন কৃষ্ণগহ্বরের অভ্যন্তরে?

তথ্যসূত্র

১. গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, স্টিফেন হকিং-শ্রদ্ধাঞ্জলি, বিজ্ঞানভাষ, মার্চ ২০১৮
২. ফরহাদ হোসেন মাসুম, স্টিফেন হকিং-এর জীবনী, বিজ্ঞানযাত্রা, মার্চ ২০১৮
৩. আজিজুল সাহাজি, স্টিফেন হকিং-এর প্রয়াণ বা এক নক্ষত্রের জীবনাবসান, বিজ্ঞানকথা
৪. অভিরূপ ঘোষ, ফেসবুক
৫. প্রীতম মজুমদার, ফেসবুক
৬. প্রত্যয় রায়, হকিং-এর জীবনতরঙ্গ, বিজ্ঞানভাষ, মার্চ ২০১৮
৭. http://www.hawking.org.uk/
৮. https://www.youtube.com/watch?v=OUpl0HDGq1Q
৯. https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking_in_popular_culture
১০. https://www.nasa.gov/pdf/223968main_HAWKING.pdf
১১. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-450794/Stephen-Hawkings-weightless-adventure.html

লেখকের পরিচিতি

লেখক হরেন্দ্র কুশারী বিদ্যাপীঠে সহকারী শিক্ষক এবং ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে অতিথি অধ্যাপক রূপে কর্মরত। লেখাপড়া কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (University College of Science) থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B.Ed. এবং Ph.D.। গবেষণার ক্ষেত্র – আয়নমণ্ডলের প্লাজমা ও তাপীয় ঘটনাবলী, আবহবিদ্যুৎ ও চুম্যান অনুনাদ, রেডিও তরঙ্গ, ভূকম্পন। বর্তমানে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Centre of Advanced Study in Radio Physics and Electronics-এ আংশিক সময়ের গবেষক। পেশাগত ও গবেষণার কাজকর্মের বাইরের সময় কাটছে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়। সায়েন্টিফিলিয়া, বিজ্ঞানযাত্রা, বিজ্ঞানপত্রিকা, জয়ঢাক, বিজ্ঞান, Scientific Mind, এডুকোয়ার্কস প্রভৃতি পত্রিকায় লেখকের বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।